

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা রহমান আর্থি

রোলঃ 227021029

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা রহমান আর্থি

রোলঃ 227021029

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারিহা রহমান আর্থি, আইডিঃ 227021029 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারিহা রহমান আর্থি

আইডিঃ 227021029

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
ধৈর্য্য বা সবরের সংগা	5
ধৈর্য্য বা সবরের প্রকারভেদ	6
আলকুরআনের দৃষ্টিতে সবর এর তাৎপর্য গুরুত্ব ও ফযীলত	6
মহা গ্রন্থ আল কুরআনে রব্বের কারিমের সবরের আয়াত ও তার পুরস্কার	11
যেসব কাজে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়	14
ধৈর্য্যের মূর্তপ্রতীক -মহানবী (সা.)	16
নবী রাসুল গনের ধৈর্য্যের পরিষ্কা ও তাদের তাওয়াক্কুল	22
প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা	25
সবর মুমিনের বিপদে সাহাবার পরশ	33
সার সারসংক্ষেপ	37

ভূমিকা

ধৈর্য্য এমন একটি গাছ যার বাকলে বাকলে রয়েছে ছোট বড় হাজারো কাটা কিন্তু যার ফল অতিই সুমিষ্ট। ধৈর্য্য এমন এক ফুল যার সুবাস জান্নাত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'য়ালা এই দুনিয়াকে মুমিনের জন্য কারাগার হিসেবে তৈরি করেছেন। মানুষ কারাগারে যেমন তার স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে না, দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত এক জীবন সে পার করে, ঠিক তেমনি দুনিয়াতে ও মানুষকে জীবনের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর এই বিপদে যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, তার রবের প্রতি তাওয়াঙ্কুল রেখে, সবর করে সেই বিপদের মোকাবেলা করতে পারে, সেই হয় প্রকৃত বিজয়ী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পবিত্র কুরআনুল কারিমে বহুবার তার বান্দাদের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করার বার্তা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ধৈর্য্যের উপর অনেক আয়াত আমরা দেখতে পাই। রব তার বান্দাকে বিপদে ফেলেন, পরীক্ষা করেন, আর দেখতে থাকেন তার কোন কোন বান্দা তার উপর তাওয়াঙ্কুল নিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে।

ধৈর্য্য বা সবরের সংগা-

জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রেখে আল্লাহর উপর গভির তাওয়াঙ্কুল করে যে কোন বালা মুসিবত, দুঃখ কষ্ট দুর্দসায় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই ধৈর্য্য বা সবর।

ধৈর্য বা সবরের প্রকারভেদ-

সবর তিন প্রকার। যথা 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ হতে বিরত থাকা। 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদত আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্মে কষ্ট স্বীকার করা। 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতে সবরের বয়ান করেছেন। সবর এমনই এক বিষয় যার ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সুস্বাদু। যারা সবর করেছে তারা ব্যতীত অন্য কেউই এর স্বাদ বুঝবে না। সবরের তাৎপর্য তুলে ধরা হলো-হাদিসে এসেছে-হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবর তিন প্রকার-

১. বিপদাপদের সময় সবর;

২. পাপাচার পরিহার করার সময় সবর;

৩. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসুলের হুকুম পালনার্থে সবর করা। সবরের গুরুত্ব বুঝাতে সাহায্যে কেরামের বক্তব্য তুলে হচ্ছে-

ক. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবর হলো ঈমানের রহস্য। যার মধ্যে সবর নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই।

খ. হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, সবর দু'প্রকার ১. বিপদের সময় সবর অবলম্বন করা; ২. পাপাচার পরিহার করার সময় সবর, আর এ সবর উত্তম।

গ. হজরত সাঈদ ইবনে যোবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, মানুষের সব কিছু আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই হয়, এ কথা বিশ্বাস করা, ছাওয়াবের অন্বেষণ করা, বিপদাপদের জন্যেও আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ছাওয়াব পাওয়া যাবে, একথা উপলব্ধি করা হলো সবর। আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক কার্যাবলীতে সবর করা কর্তব্য।

(আংশিক সংযোজিত-জাগো নিউজ)

আলকুরআনের দৃষ্টিতে সবর এর তাৎপর্য গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবার অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে সবার শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবারের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস সাবিরীন, ইবনুল কাযিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘আততাহরীর ওয়াততানবীর’ কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবার শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]

যাহোক সবার শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবার মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

সবার শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন

অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আফহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন’-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন
والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল
এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلٰی مَا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتّٰی اَنۡتَهُمۡ نَصَرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللّٰهِ وَ لَقَدْ جَاۤءَكَ مِنْ نَّبَیِّ الْمُرْسَلِیۡنَ ۝

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪
এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنۡ نَّهَارٍ فَهَلْ يٰۤهَلِكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। সূরা আহকাফ (৪৬) :

৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اٰتُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি ইরশাদ করেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيۡنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ۝

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

তিনি আরো বলেন

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَوْا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। সূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেন

وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً وَ يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَ مَن صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন

করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রাদ (১৩) : ২২-২৫
আরো ইরশাদ হয়েছে

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُوهَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.
এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবার অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। সূরা কাসাস (২৮) : ৫৪
তিনি আরো বলেন

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককেই যখন তারা সবার অবলম্বন করল এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২) : ২৪

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবার ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবার ও ধৈর্য।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবার ও ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবার ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবার অবলম্বন করতে হবে।

(সংগ্রহ -আল কাউসার

লেখক-মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম)

মহা গ্রন্থ আল কুরআনে রব্বের কারিমের সবারের আয়াত ও তার পুরস্কার

পবিত্র কোরআনে মানুষকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব পুরস্কার লাভের শর্ত হলো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য তা করা। কেউ যদি এই চিন্তা থেকে ধৈর্য ধারণ করে যে মানুষ তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বলবে, তাহলে সে আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিদান পাবে না। বরং তা তার জন্য বিপদের কারণ হবে।

সবর(صبر)আরবি শব্দ, যার বাংলা অর্থ ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা। মানুষের উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে ধৈর্য অন্যতম একটি উপাদান। যার ধৈর্য আছে, তার সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ আছেন। ধৈর্যের সরাসরি

নির্দেশ দিয়ে আল কোরআনে ২৫টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি হাদিসের সংখ্যাও নেহায়েত কম না। এ প্রবন্ধে পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণের ৭টি নির্দেশমূলক আয়াত তুলে ধরা হলো।

শুভ পরিণতির জন্য ধৈর্যধারণ করুন :

ধৈর্যশীল ব্যক্তি সব কাজে যখন মহান রবের সিদ্ধান্তের পানে তাকিয়ে থাকেন, তখন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ধৈর্যের শুভ পরিণতি দান করেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই।

(সূরা হুদ : ৪৯)।

উত্তমভাবে ধৈর্যধারণ করুন :

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.)-কে উত্তম ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

‘অতএব আপনি (হে নবী) উত্তম সবর করুন।’ (সূরা মাআরিজ : ৫)।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন :

আল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে মানুষকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে অবিচল থেকে কোন অত্যাচারী কর্তৃক অত্যাচারিত হলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ প্রদান করে বলা হয়েছে :

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

‘আপনি তো কেবল তাই অনুসরণ করেন, যা ওহির মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর করুন যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করেন।’ (সূরা ইউনুস : ১০৯)।

কর্মফল অক্ষত রাখতে সবর করুন :

নির্বোধরা মনে করে যে, শক্তি প্রদর্শন করাই সম্মান বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু মোমিনরা নির্বোধদের এই হীন চিন্তা থেকে বিমুখ থাকেন। কারণ, তারা আল্লাহর এই ঘোষণা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রাখেন :

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

‘আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ পুণ্যবানদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।’ (সূরা হুদ : ১১৫)।

চিন্তামুক্ত থাকতে ধৈর্যশীল হোন :

কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি যখন মোমিনকে কটাক্ষ করে কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করে তখন মোমিনরা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে রক্ষাকবচ বলে মনে করেন। এরশাদ হয়েছে :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

‘আপনি (হে নবী) সবর করুন, আপনার এই সবরের তৌফিক তো আল্লাহই দিয়েছেন। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।’ (সূরা আন-নাহল : ১২৭)।

কাপুরুষ না হতে সবর করুন :

আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মান্য করা মোমিনের একান্ত কর্তব্য। মোমিনের আরও কর্তব্য হচ্ছে যে, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে না। কারণ, বিবাদে লিপ্ত হলে কাপুরুষতা ভর করবে। আল্লাহ বলেন :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

‘তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (সূরা আনফাল : ৪৬)।

বিপদাপদে ধৈর্যশীল হোন :

লোকমান (আ.) তার পুত্রকে যে ক’টি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তন্মধ্যে ধৈর্যধারণ করা ছিল অন্যতম একটি। পবিত্র কোরআনে সূরা লোকমান নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা অবতীর্ণ করে লোকমান হাকিমের সেই উপদেশাবলি আল্লাহ সংরক্ষিত করেছেন। এরশাদ হয়েছে :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

‘হে বৎস! নামাজ কয়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ।’ (সূরা লোকমান : ১৭)।

হজরত আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের লেখা সমাপ্তি করব। রাসুল (সা.) বলেছেন :

‘এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস যা আকর্ষণীয়।’ (মুসলিম : ২৮২৩)। আলোচ্য কালামেপাকের নির্দেশনাবলির মাধ্যমে ধৈর্যধারণের যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের পার্থিব জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে পরকালীন অনন্ত সুখী জীবন লাভ করা প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব।

(লেখক : পিএইচডি গবেষক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল্লাহ বলেন

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

‘এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম।’ (সুরা রাদ, আয়াত : ২২)

যেসব কাজে ধৈর্য ধারণ করতে হয়

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন—

১. জাগতিক বিপদে :

এই পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার। রোগ, বালাই, অসুস্থতা, মৃত্যু ও অভাবের মতো বিপদের দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, পৃথিবীর প্রতি যার কোনো অভিযোগ নেই। জাগতিক এসব বিপদের সর্বোত্তম চিকিৎসা ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

‘আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি শুভ সংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)

২. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধৈর্য :

দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবী মানুষের ভেতর টিকে থাকার দুর্বীর ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে, যা একসময় তার ভেতর মোহ তৈরি করে। নারী, ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি ও খ্যাতির মোহ থেকে তার ভেতর জন্ম নেয় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি থেকে বাঁচা মানুষের জন্য কষ্টকর কাজ। এ জন্য প্রয়োজন হয় ধৈর্যের। ইরশাদ হয়েছে,

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

‘নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে।

এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪)

তবে ইসলাম মানুষকে সীমার মধ্যে থেকে বৈধ উপায়ে তার চাহিদা পূরণের অনুমতি দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
‘তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنِيَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قَائِنَاتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
‘তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ২৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ
‘যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাইতো উত্তম।’ (সুরা নাহল, আয়াত : ১২৬)

৩. আল্লাহর আনুগত্য :

আল্লাহ তাআলা বহু বিধান দান করেছেন। ব্যক্তি ধৈর্যশীল না হলে, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করা, সম্পদের মোহ ত্যাগ করে জাকাত প্রদান করা, হজ ও জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
‘তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো।’ (সুরা মারিয়াম, আয়াত : ৬৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

‘এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও তাতে (ধৈর্যসহ) অবিচল থাকো, আমি তোমার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য।’ (সূরা তাহা, আয়াত : ১৩২)

আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণের ব্যাখ্যা

আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণের তিনটি পর্যায় হয়। তা হলো—

এক. আনুগত্যের আগে : ইবাদতের আগে নিয়ত বিশুদ্ধ করা এবং ইবাদতের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জ্ঞানী মাত্রই জানেন নিয়তের বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করা কোনো সাধারণ কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

‘তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামাজ কায়েম করতে। এটাই সঠিক দ্বিন।’ (সূরা বাইয়িনা, আয়াত : ৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

‘নিশ্চয়ই আমলের পরিণাম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১)

দুই. আনুগত্যের সময় : শরিয়ত বহু বিধান প্রণয়ন করেছে এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছে কিছু শিষ্টাচার। বিধান পালন করা যতটা সহজ, শিষ্টাচারগুলো মান্য করা ততটা সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ নামাজ পড়া খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু পাবন্দির সঙ্গে নামাজ আদায় করা, খুসু-খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করা, শীতের ভেতর মসজিদে যাওয়া কঠিন কাজ।

তিন. আনুগত্যের পরে : মানুষ যখন কষ্ট সহ্য করে কোনো ইবাদত করে, তখন তার এই ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে মানুষ তার ভালো কাজের প্রশংসা করুক, সমাজে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক। খ্যাতির এই মোহ মানুষের বহু মূল্যবান আমলকে মূল্যহীন করে ফেলে। তাই মুমিনের উচিত অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্থান না দেওয়া।

(তামিরে হায়াত থেকে)

মো. আবদুল মজিদ মোল্লার ভাষান্তর)

ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক -মহানবী (সা.) :

তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখগুণ্ডলের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা

এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখগুণ্ডে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে তেমন কোনো শুভাকাক্সক্ষী না থাকা অবস্থায়ই তার জীবনের ৪০টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। কোরাইশের লোকরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্ৰোপবাণে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছু ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, **بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا** 'যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে ফেলবেন।' (সূরা কাহফ : ৬)।

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর:

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ পথে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে বহু কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جُرُورٍ، فَقَفَّزَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هَشَامٍ، وَعُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ - أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ ". فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُبِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْفُوا فِي بَيْتٍ، غَيْرَ أُمَيَّةٍ أَوْ أَبِي، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرَّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبَيْتِ ۖ

একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কোরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে

দিল। ফলে তিনি তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, ‘হে আল্লাহ! কোরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।’ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।’ (বোখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য:

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কোরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে বরদাশত করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার।

উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِءَاءَهُ فِي عُقْبِهِ فَخَنَفَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَا تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (غافر: 28)

আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, ‘তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?’ (বোখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর:

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতির লব্ধি চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের

বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্বনবী (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَغْنِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ " الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَافٌ أَشَدَّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ. " ۞

‘হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?’ তিনি বললেন, ‘নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)।

রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبَلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ دُو كَيْدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُؤَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . - وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارًّا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ ۞

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহরও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।’ (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ:

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে ‘শোকের বছর’ বলে নামকরণ করেন।

যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، وَمُحَمَّدٌ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أُرْسِلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأَنْتَبْنَا. فَأُرْسِلَ يُقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ " إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَنْصَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ". فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجَالٌ، فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَفَّعُ - قَالَ حَسِبْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ - كَأَنَّهَا شَنْ. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ". ٥

মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, ‘আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।’ তিনি বলে পাঠালেন, ‘(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।’ তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?’ তিনি বললেন, ‘এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।’ (বোখারি : ১২৮৪)।

‘আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا فُرَيْشٌ - هُوَ ابْنُ حَيَّانَ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْفَقِيرِ - وَكَانَ ظَنُرًا لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ". ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ ". رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তিনি বলেন, আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আবু সাইফ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী -তনয়) ইব্রাহীম (রাঃ)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্রাহীম (রাঃ)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং

নাকে-মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তাঁর (আবু সাযফ-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্রাহীম (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উভয় চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন ‘আবদুর রহমান ইব্নু ‘আওফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আর আপনিও? (ক্রন্দন করছেন?)। তখন তিনি বললেনঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। [১৭] আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।

মূসা (রহঃ)....আনাস (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাদিসটি হতে বিপদে অশ্রু ঝড়ানো আর মহান আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশক শব্দাবলী বাদ দিয়ে মুখে শোক প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর নাফরমানী হয় কিংবা তাকদীরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশক শব্দাবলী পরিত্যাগ করার তাকীদ দেয়া হয়।

এ ধরনের বাকরীতি বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান আছে। সুতরাং আরবীতে তো থাকবেই। বিধায় মৃত ব্যক্তিকে সংশোধন করার দলীল হিসাবে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীটি ব্যবহার করার কোনই অবকাশ নেই। সহিহ বুখারী: ১৩০৩

(আংশিক সংযোযিত-কালেরকণ্ঠ)

নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ধৈর্যের বটো বৃক্ষ। আমরা অল্প একটু কষ্টেই বিলাপ করা শুরু করে দেই, আমাদের মনে হয় কেউ যেন সিনা থেকে কলিজাটা ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেকোন বিপদে আমরা এতই ধৈর্য হারা হয়ে যাই যে মাঝে মাঝে যেন আমরা নিজের জীবন নিজেই কেড়ে নিতে চাই। যেন মনে হয় আর এ জীবনের দরকার নাই, এত বিপদ এত কষ্ট এত পরীক্ষা এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। মাঝে মাঝে আমরা আল্লাহকে ও দোষারোপ করে বসি। বলতে থাকি ইয়া আল্লাহ আমার উপরেই কেন এত বিপদ, আমি কি পাপ করেছি, আমাকেই আপনি বেছে নিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)। এমনও হাজার হাজার প্রশ্ন আমরা আল্লাহ কে করতে থাকি। অথচ আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দোজাহানের বাদশার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি, আশ্বিয়াদের নেতা, রব্বুল আমিনের সবচেয়ে প্রিয় রাসুলের জীবনকে তিনি সাজিয়েছিলেন দুঃখ দুর্দশা, কষ্ট বেদনা, হাজারো মুসিবত দিয়ে। তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরতে পরতে সাজিয়েছিলেন বিপদ ও বালা মুসিবত দিয়ে। তার জীবনী থেকে আমরা দেখতে পাই, তার জীবনে একটিবারও তিনি আশা হতো হননি, তার রবের প্রতি তাওয়াক্কুল হারাননি। তবে কেন আমরা এত সহজেই রবের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, অধৈর্য হয়ে যাই, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা। বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই আমাদের ভাবা উচিত, নিজেকে গভীর চিন্তায় মগ্ন করা উচিত, নিজেকে সাঁপে দেয়া উচিত রবের প্রতি।

নবী রাসুল গনের ধৈর্যের পরীক্ষা ও তাদের তাওয়াক্কুল:

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোরআনের ভাষ্যমতে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনকি যুগে যুগে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবী-রাসুলরাও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্যের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুসংবাদ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

‘আমি তোমাদের সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব, আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা বিপদে আক্রান্ত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই ফিরব।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)

ধৈর্য নবীদের বৈশিষ্ট্য

সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ " الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأُمَثَلُ فَلَا أَمَثَلَ فَيُنْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صَلَاحًا اسْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرُخُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُخْتُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأُمَثَلُ فَلَا أَمَثَلَ

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে কে সব চেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়? তিনি বলেন, প্রথমত নবীরা, অতঃপর যারা তাদের মতো। অতঃপর মানুষকে তার দিনদার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। কেউ শক্তভাবে দিন অনুসরণ করলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়ে থাকে। কেউ দিনদারিতে শিথিল হলে তার পরীক্ষাও তেমন হয়।

অতঃপর বান্দা একের পর এক বিপদে আক্রান্ত হতে থাকে। একপর্যায়ে সে পুরোপুরি গুনাহমুক্ত হয়ে ভূমিতে চলাফেরা করে।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

নবীদের ধৈর্যের পরীক্ষা

নিম্নে কঠিন সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসুলের ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান : প্রায় হাজার বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্যসংখ্যক মানুষ তার ধৈর্য আহ্বানে সাড়া দেয়।

তবু তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিক্রপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথের আহ্বান অব্যাহত রাখেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘আমি তো নুহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন, অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। অতঃপর আমি তাকে ও যার নৌকাবাসীকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪-১৫)

২. ধৈর্যশীলদের প্রতীক যিনি :

আইয়ুব (আ.) নবী ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

‘স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে। আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আপনি এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সূরা সাদ, আয়াত : ৪১-৪৪)

৩. যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু :

শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাভান ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার

জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
‘দিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।’ (সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫)

৪. দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্তানের সন্ধান :

ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ৷

‘তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।’ (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮)

অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ
يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ ৷

‘তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন।...তিনি বলেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।’ (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬-৮৭)

৫. মাছের উদরে আল্লাহকে স্মরণ :

ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছ উদরে। সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ৷

أَلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
 أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ
 فَوَاكِهُ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ
 فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
 عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।’ (সূরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

তাই পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে তার কথা উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা হতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ
 ‘অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি মাছাওয়ালা মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন। তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে তিনি লাজ্জিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিষ্কিণ হতেন।’ (সূরা কলম, আয়াত : ৪৮)

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

সেই নিদারুণ দুঃসময়েও মুসলমানরা কিভাবে অটল অবিচল থাকতে সক্ষম হলেন ? এ কথা ভেবে শক্ত মনের মানুষও অবাক হয়ে যান। কি নির্মম নির্যাতনের মুখেও মুসলমানরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অত্যাচার নির্যাতনের বিবরণ পাঠ করে দেহ-মন শিউরে উঠে। কি সেই সম্মোহনি শক্তি, যার কারণে মুসলমানরা এতোটা অবিচলিত ছিলেন ? এ সম্পর্কে পরবর্তী নীচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

ঈমানের সৌন্দর্য

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর সঠিক পরিচয় জানা। ঈমানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়েও অটল থাকে। যার ঈমান এ ধরনের ময়বুত এবং শক্তিশালী, তিনি যে কোন অত্যাচার নির্যাতনকে সমুদ্রের ওপরে ভাসমান ফেনার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন না। এ কারণেই মোমেন বান্দা ঈমানের মিষ্টতা এবং মাধুর্যের সামনে কোন বিপদ বাধাকেই পরোয়া করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যা আর্বজনা, তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকার আসে, তা জমিতে থেকে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মতে ইসলামিয়া বরং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক পূর্ণতা, প্রশংসনীয় চরিত্র, চমৎকার ব্যক্তিত্ব, পরিশীলিত অভ্যাস ও কর্মতৎপরতা দেখে আপনা থেকেই তাঁকে ভালোবাসার ইচ্ছা জাগতো। তার জন্যে মন উজাড় করে দিতে ইচ্ছা হতো। মানুষ যেমন গুণ বৈশিষ্ট্য মনে প্রাণে পছন্দ করে, সেসব তার মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, এতোগুলো গুণবৈশিষ্ট্য একত্রে অন্য কাউকেই দেয়া হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষমাশীলতা, আমানতদারি, সততা সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ এতো বেশী ছিলো যে, তাঁর স্বাভাব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শত্রুরাও কখনো সন্দেহ পোষণ করেনি। তিনি যে কথা মুখে একবার উচ্চারণ করতেন তাঁর শত্রুরাও জানতো যে, সে কথা সত্য এবং তা বাস্তবায়িত হবেই হবে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণও পাওয়া যায়। একবার কোরায়েশীদের তিনজন লোক একত্রিত হয়েছিলো, তারা প্রত্যেকেই গোপনে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছিলো কিন্তু কারো কাছে সে কথা প্রকাশ করেনি। এদের মধ্যে আবু জেহেলও ছিল একজন। অন্য দুজনের একজন আবুজেহেলকে প্রশ্ন করলো যে, মোহাম্মদের কাছে যা কি শুনেছো, বলতো, সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি? আবু জেহেল বললো, আমি কি শুনেছি? আসলে কথা হচ্ছে যে, আমরা এবং বনু আবদে মন্নাফ আভিজাত্য ও মর্যাদার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মোকাবিলা করতাম। তারা গরীবদের পানাহার করালে আমরাও তা করতাম, তারা দার খয়রাত করলে আমরাও দান খয়রাত করতাম। ওরা এবং আমরা ছিলাম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা ছিলাম রেসের ঘোড়ার দুই প্রতিযোগির মত। এমনি অবস্থায় আবদে মন্নাফ বলতে শুরু করলো যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, তাঁর কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। বলতো আমরা কিভাবে ওরকম ওহী পেতে পারি? খোদার কসম, আমি ঐ ব্যক্তির উপর কখনো বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং কখনো তাকে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি দিব না। আবু জেহেল বলতো, হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছো তাকে মিথ্যা বলি। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ওরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু ওইসব জালেম আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। ইতিপূর্বে এ ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌত্তলিকরা রসুল (সাঃ) কে এতদিন গালাগাল করছিলো। পরপর তিনবার এরূপ করলো। তৃতীয়বার রসুলে করিম (সাঃ) থমকে দাড়িয়ে বললেন, হে কোরাইশদল, আমি তোমাদের কাছে যবাইয়ের পশু নিয়ে এসেছি। একথা শুনার সাথে সাথে কাফেররা আল্লাহর রসুলকে ভালো ভালো কথা বলে খুশি করার চেষ্টা করতে লাগলো। ইতুপূর্বে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসুল (সাঃ) সেজদা দেওয়ার সময় কয়েকজন কাফের তাঁর ঘাড়ের উপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো। নামাজ শেষে রসুলে করিম (সাঃ) এরপু কাজ যারা করেছিলো তাদেরকে

বদ-দোআ দিয়েছিলেন। সেই বদ-দোআ শুনে কাফেরদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তারা গভীর চিন্তা পরে গেল। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, এবার আর তারা রেহাই পাবে না। এ ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লাহাবের পুত্র ওতাইবাকে বদদোয়া করার পর সে বুঝেছিলো যে, এর পরিণাম থেকে সে রক্ষা পাবে না। সিরিয়া সফরের সময় বাঘ দেখেই সে বলেছিলো, আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ মক্কায়ে থেকেই আমাকে হত্যা করেছেন। উবাই ইবনে খালফের ঘটনায় রয়েছে যে, এই লোকটি বারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার হুমকি দিতো। এ ধরনের হুমকির জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বলেছিলেন, তুমি নও বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ। এরপর ওহদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য একজন সাহাবী হাত থেকে একটি বর্শা নিয়ে উবাইয়ের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এতে তার ঘাড়ের কাছে সামান্য যখম হয়েছিলো। পরে উবাই বারবার বলেছিলো, মোহাম্মদ মক্কায়েই বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো। তিনি যদি আমাকে থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবুও আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতো। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লেখ করা যায়। একবার হযরত সা'দ ইবনে মাযায় মক্কার উমাইয়া ইবনে খালফকে বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলকে শুনছি যে, মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। এ ভয় সব সময়েই তার ছিলো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, মক্কার বাইরে কখনো যাবে না। বদরের যুদ্ধের সময় আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সবচেয়ে দ্রুতগামী উট ক্রয় করলো, যাতে বিপদের আশঙ্কার সময় দ্রুত পালিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বলেছিলো, আবু সফওয়ান, আপনার ইয়াসরেবী ভাই যে কথা বলেছিলেন, আপনি কি সে কথা ভুলে গেছেন? উমাইয়া বললো, না ভুলিনি, আমি তো ওদের সাথে অল্প কিছু দূরে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের অবস্থা ছিলো এ রকম। তাঁর সঙ্গী এবং সাহাবাদের অবস্থাতে এমন ছিলো যে, তারা মনে প্রাণে প্রিয় নবীর প্রতি নিবেদিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবাদের ভালোবাসা এতো তীব্র ছিলো যেন তা পাহাড়ী ঝর্ণার পানির ধারা। লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সাহাবারাও তেমনি আল্লাহর রাসূল (স) এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। কবি বলেন, তাঁর চেহারা সব মানব দেহের জন্যে অস্তিত্ব স্বরূপ, তাঁর অস্তিত্ব ছিলো প্রতিটি অন্তরের জন্যে চুম্বকের মতো। এ ধরনের ভালোবাসা এবং নিবেদিত চিন্তার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের ওপর কারো আঁচর এবং তাঁর পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও সহ্য করতে পারতেন না। এর বিনিময়ে তারা নিজেদের মাথা কাটিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকতেন। দুর্বৃত্ত ওতবা ইবনে রবিয়া একদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে মারাত্মকভাবে প্রহার করলো। তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করে দেয়া হলো। তীব্র প্রহারের এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। খবর পেয়ে তাঁর গোত্র বনু তাইমের লোকেরা তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিল। তাঁর বাঁচার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিলো। দিনের শেষে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? একথা শুনে বনু তাঈম গোত্রের যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো, তারা বিরক্তি প্রকাশ করলো। তারা উঠে যাওয়ার সময় হযরত আবু বকরের মাকে বললো, ওকে কিছু খাওয়াতে পারেন কিনা দেখুন। আবু বকর (রা) তাঁর মা উম্মুল খায়েরের কাছে আল্লাহর রাসূলের খবর জানতে চাইছিলেন। তিনি বললেন, আমি তো জানি না বাবা। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, মা, আপনি উম্মে জামিল বিনতে খাতাবের কাছে যান। তাঁর কাছ থেকে আমাকে আল্লাহর রাসূলের খবর এনে দিন। উম্মুল খায়ের উম্মে জামিল বিনতে খাতাবের কাছে গেলেন, তাঁকে বললেন, আবু বকর তোমার কাছে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চাইছেন। উম্মে জামিল বললেন, আমি আবু বকরকেও জানি না, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকেও জানি না। তবে আপনি যদি চান, তাহলে আমি আবু বকরের কাছে যেতে পারি। উম্মুল খায়ের উম্মে জামিলকে তাঁর পুত্রের কাছে নিয়ে এলেন। হযরত আবু বকরের অবস্থা দেখে উম্মে জামিল চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বললেন, যে কওমের লোকেরা আপনার এ দুরবস্থা করেছে, নিসন্দেহ তারা দুর্বৃত্ত এবং কাফের। আমি আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আপনার পক্ষে ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। হযরত আবু বকর(রা) আল্লাহর রাসূলের খবর জানতে চাইলেন। উম্মে জামিল উম্মুল খায়েরর প্রতি ইশারা করলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, অসুবিধা নেই। উম্মে জামিল বললেন, তিনি ভালো আছেন এবং ইবনে আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাদের আল্লাহর রাসূলের কাছে না নেয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুই পানাহার করবো না। উম্মুল খায়ের এবং উম্মে জামিল অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্কার পর লোক চলাচল কমে গেল এবং অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর মা উম্মুল খায়ের এবং উম্মে জামিলের কাঁধে ভর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলেন। ভালোবাসা এবং নিবেদিতচিত্ততার আরো কিছু বিস্ময়কর ঘটনা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থান, বিশেষত ওহূদের যুদ্ধের ঘটনার এবং হযরত যোবায়ের (রা) এর ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. দায়িত্ব সচেতনতা

সাহাবায়ে কেরাম ভালোভাবেই জানতেন যে, মাটির মানিষের ওপর যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে দায়িত্ব যতো কঠিনই হোক না কেন, উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। কেননা সে দায়িত্ব উপেক্ষার পরিণাম হবে আরো বেশী ভয়াবহ। এতে সমগ্র মানব জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সেই ক্ষতির তুলনায় এ যুলুম অত্যাচার বিপদ মুসিবতের কোন গুরুত্বই নেই।

চার. পরকালের ওপর বিশ্বাস

আখেরাত বা পরকালের জীবনের ওপর বিশ্বাস উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের কঠোর সংযমী ও সহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করেছে। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সুদৃঢ় ও অবিচল আস্থা পোষণ করতেন যে, তাদেরকে একদিন রব্বুল আলামিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। সেখানে জীবনের ছোট বড় সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। এরপর হয়তো নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত অথবা ভয়াবহ শাস্তিভরা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। এ বিশ্বাসের বলে সাহাবায়ে কেরাম আশা ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। প্রিয় প্রভু আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করতেন এবং তার আযাবকে ভয় করতেন। তাঁদের অবস্থার কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এভাবে উল্লেখ করেন তারা যা কিছু সম্পাদন করে সেটা করে অন্তরে ভয়ভীতির সঙ্গে। এ কারণে করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তাঁরা একথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এ পৃথিবীর সকল আরাম-আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং দুঃখষ্টসহ পরকালের তুলনায় একটি মশার একটি পাখার সামান্য মূল্যও রাখে না। এ বিশ্বাস তাঁদের এতো অবিচল এবং অটুট ছিলো যে, এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব বিপদ-আপদ তিক্ততা দুঃখকষ্ট ছিলো তুচ্ছ।

পাঁচ. কঠিন থেকে কঠিনতর সে অবস্থা

কোরআনের যেসব আয়াত পর্যায়ক্রমে নাযিল হচ্ছিল, তাতে ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষা ও আদর্শ আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হচ্ছিল। কোরআনের সেসব আয়াত মানব জাতির সামনে সবচেয়ে সম্মানজনক ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ইসলামী সমাজের ঈমানের সজীবতা এবং দৃঢ়তাকে আরো শক্তিমান করে তোলা হচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করছিলেন এবং হেকমত বা কৌশল মুসলমানদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّنَتْهُمْ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَرَأَوْا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসুল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? হাঁ আল্লাহর সাহায্য কাছেই”। {সূরা বাক্বারা আয়াত ২১৪} আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

الم
أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। {সূরা-আনকাবুত, আয়াত ১-৩}

পাশাপাশি এমন সব আয়াত নাযিল হচ্ছিল যেসব আয়াতে কাফের মুশরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হচ্ছিল। তাদের কোন অজুহাতই ধোপে টেকার মত ছিল না। সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের বলে দেয়া হচ্ছিল যে, যদি তারা তাদের পথভ্রষ্টতা এবং হটকারীতার উপর অঠল থাকে তবে পরিণাম হবে মারাত্মক। উদাহরণ হিসেবে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের এমন সব ঘটনা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে যে, ওতে আল্লাহর রসুল ও কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহর নীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সাথে দয়া ও ক্ষমার কথাও বলা হয়েছে। এবং পথ নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। এসব বলা হয়েছে এ জন্য যে অবিশ্বাসীরা যেন নিজেদের পথ ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী থেকে বিরত থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোরআন মুসলমানদেরকে এক ভিন্ন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়ে এনেছে। তাদ;এর সামনে বিস্ময়কর সব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে তারা হত্যোদম হয়ে না পরে কোন বাধা বা প্রতিকূলতাই যেন তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। এসকল আয়াতে মুসলমানদেরকে এমন সব কথাও বলা হয়েছে, যার দ্বারা মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারে। আর অবিশ্বাসীদের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা আল্লাহর দরবারে ফয়সালার জন্য হাযির করার কথা জানতে পারে। তাদের পার্থিব জীবনের পুণ্যের কোন স্থান পাবে না বরং তাদেরকে টেনে হিচরে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে, এবার দোজখের স্বাদ গ্রহণ করো চিরদিন ধরে।

ছয়. কঠোর ধৈর্য্য

এসব কথা ছাড়াও মুসলমানরা অত্যাচারিত হওয়ার কেবল শুরু থেকেই নয়, বরং তার আগে থেকেই এটা জানতো যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এই নয় যে, চিরস্থায়ী দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। বরং ইসলামি দাওয়াতের মূল কথাই ছিল জাহেলী যুগের অবসান, সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মূল উৎপাতন। ইসলামী দাওয়াতের একটা লক্ষ্য এটাও ছিল যে, মুসলমানরা পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করবে এবং রাজনৈতিকভাবে এমন বিজয় অর্জন করবে, যাতে সকল মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা যায়। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করানো যায়। কোরআনুল করিমের এসব সু-সংবাদ কখনো ঈশারা এবং কখনো খোলাখুলি ভাবে নাযিল হচ্ছিল। একদিকে এমন অবস্থা ছিল যে, প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, তাদের টিকে থাকাই ছিলো কঠিন। তাদেরকে উচ্ছেদ করতে একদল লোক ছিল সদা সক্রিয়। অন্যদিকে মুসলমানদের শক্তি সাহস ও মনোবল বাড়াতে এমন সব আয়াত নাযিল হচ্ছিলো যাতে পূর্বকালের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী সময়ের নবীদের অভিশ্বাস করা হয়েছে এবং তাদের উপরও অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হয়েছে। সেসব আয়াতে যে চিত্র অনকন করা হচ্ছিল তার সঙ্গে মক্কার মুসলমান ও কাফেরদের অবস্থা হুবহু সাদৃশ্য ছিল। পরিশেষে একথা

উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে অবিশ্বাসীরা কিভাবে ধ্বংস এবং আল্লাহর পুন্যশীল বান্দাদের তাঁর জমীনের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। পরিণামে মক্কার অবিশ্বাসীরাই ব্যর্থ ও পরাজিত ও মুসলমান এবং ইসলামের দাওয়াতের সাফল্যই অর্জিত হবে। সেই সময় এমন সব আয়াতও হয়েছে, যেসব আয়াতে ঈমানদারদের বিজয়ের সু-সংবাদ সুপষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। অতএব কিছুকালের জন্যে তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি ওদের পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে। ওরা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? তাদের আগ্নেয় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রতিফল ভয়াবহ ও জঘন্য হবে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। হাবশায় হিজরতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَآ جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরও আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়ায় তাদের আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ। হায় ওরা যদি সেটা জানতো।” (৪১,১৬) অবিশ্বাসীরা আল্লাহর রসুলকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা জিজ্ঞাসা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَلِّينَ

“জিজ্ঞাসুদের জন্য নির্দশন রয়েছে” (৭,১২) অর্থাৎ মক্কাবাসীরা আজ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কথা জিজ্ঞাসা করছে এবং ঠিক সেরকমই ব্যর্থ হবে, যেমন ব্যর্থ হয়েছিল হযরত ইউসুফের ভাইয়েরা। এদের পরিণাম হবে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের পরিণামের মতই। কাজেই হযরত ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা থেকে মক্কাবাসির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বোঝা উচিত যে, অত্যাচারীদের পরিণাম কি ধরনের হয়ে থাকে। এক জায়গায় পয়গম্বরদের প্রসঙ্গ আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

কাফেররা তাদের রসুলদের বলেছিলো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বিহস্কার করবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মদর্শে ফিরে আসতেই হবে। অতঃপর রসুলদের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন। যালেমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করবো। (১৩-১৪) পারস্য ও রোমে যখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলছিলো, কাফেররা চাচ্ছিলো পারস্যবাসী যেন জয়লাভ করে। কেননা রোমকরা আল্লাহ তাআলা, পয়গম্বর, ওহী, আসমানী

কিতাবে বিশ্বাসী বলে দাবী করতো। পারস্যবাসীরা জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ এ সু—সংবাদ প্রদান করেন যে, “ কয়েক বছর পর রোমকরা জয়লাভ করবে। শুধু এ সু-সংবাদই দেয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তাআলা এই সু-সংবাদও দিয়েছিলেন যে, রোমকদের বিজয়ের সময় আল্লাহ তাআলা মোমেনদেরও বিশেষভাবে সাহায্য করবেন। এই সাহায্য পেয়ে তারা খুশি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর সেদিন মোমেনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। (৪৫,৩০) পরবর্তী সময়ে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের দ্বারা আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিলো। কোরআনের ঘোষণা ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন সময়ের মুসলমানদেরকে এ ধরনের সু-সংবাদ শোনাতেন। হজ্জের সময় ওকায, মায়ন এবং যুলমাজাযের বাজারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের কাছে তাঁর নবুয়তের কথা প্রচার করতেন। সে সময় তিনি শুধু বেহেশতের সু-সংবাদই দিতেন না, বরং সুস্পষ্টভাবে একথাও ঘোষণা করতেন, হে লোক সকল, তোমরা বলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এতে আমরা সফলকাম হবে। এর বদৌলতে তোমরা হবে আরবের বাদশাহ এবং অন্যরাও তোমাদের পদানত হবে। আর মরণের পরও তোমরা জান্নাতের ভেতর বাদশাহ হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে ও ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওতবা ইবনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং ঐশ্বর্যের লোভ দেখাচ্ছিলো এবং জবাবে তিনি হা-মীম সেজদা সূরার কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনেছিলেন, তখন ওতবা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে। আবু তালেবের কাছে কোরাইশদের সর্বশেষ প্রতিনিধি দল দেখা করতে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জবাব দিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে সেই জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর তওহীদ বিশ্বাস স্থাপন করো, এর ফলে সমগ্র আরব তোমাদের অধীনস্থ হবে এবং অনারবের ওপরও তোমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত খাব্বার ইবনে আরত (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি কাবাঘরের ছায়ায় একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে শায়িত ছিলেন। সে সময় আমরা পৌত্তলিকদের হাতে অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত হচ্ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই পারেন। এ কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তোমাদের পরবর্তী সময়ে ঈমানদারদের অবস্থা এমনও হয়েছিলো যে, লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের গোশত খুলে নেয়া হতো, দেহে থাকতো শুরু হাড়। এরূপ বললেন, আল্লাহ তাআলা দ্বীণের ওপর বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা দ্বীণকে পূর্ণতা প্রদান করবে। একজন ঘোড় সওয়ার সানয়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, এ সময়ে আল্লাহর ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। তবে হাঁ বকরিদের ওপর বাঘের ভয় তখনো থাকবে। একটি বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, কিন্তু তোমরা তাড়াছড়ো করছো। স্মরণ রাখা দরকার যে, এসব সু-

সংবাদ কোনো গোপনীয় বিষয় ছিলো না। এসব কথা ছিলো সর্বজনবিদিত। মুসলমানদের মতোই কাফের অবিশ্বাসীরাও এসব কথা জানতো। আসওয়াদ ইবনে মোত্তালেব এবং তার বন্ধুরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো তোমাদের কাছে সারা দুনিয়ায় বাদশাহ এসে পড়েছে। ওরা খুব শীঘ্রই কেসরা কায়সারকে পরাজিত করবে। এসব কথা বলে তারা শিশ মারতো এবং হাততালি দিতো। মোটকথা সাহাবায়ে কেরামের ওপর সে সময় যেসব যুলুম অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হতো সেসব কিছু বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস এবং সুসংবাদের মোকাবেলায় ছিলো তুচ্ছ। এসব অত্যাচারকে সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন এক খন্ড মেঘের মতো, যে মেঘ বাতাসের এক ঝাপটায় দূর হয়ে যাবে। এছাড়া ঈমাণদারদের ঈমানের পরিপক্বতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে নিয়মিতভাবে সাহাবায়ে রুহানী খাবার সরবরাহ করতেন। কোরআন শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তাদের মানসিক পরিশুদ্ধতার ব্যবস্থা করতেন। ইসলাম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, রুহানী শক্তির ব্যবস্থা, মানসিক পরিচ্ছন্নতা চারিত্রিক সৌন্দর্যের শিক্ষা সাহাবাদের মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের ঈমানের নিভু নিভু স্ফুলিঙ্গকে উজ্জল শিখায় পরিণত করতেন। অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে হেদায়াতের আলোকে পৌঁছে দিতেন। এর ফলে সাহাবাদের দ্বীনী শিক্ষা ও বিশ্বাস বহুগুণ উন্নত হয়ে গিয়েছিলো। প্রবৃত্তির দাসত্ব ছেড়ে তারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভের পথে অগ্রসর হতেন। জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আগ্রহ, জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আত্ম সমালোচনায় তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। এসব কারণে বিধর্মী পৌত্তলিকদের অত্যাচার নির্যাতন তাঁদেরকে লক্ষ্য পথ থেকে দূরে সরাতে পারেনি, ধৈর্য সহিষ্ণুতা তাঁরা ছিলেন অটল অবিচল। বিশ্ব মানবের জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছিলেন এক একজন উজ্জল আদর্শ।

(সীরাতুন্নবী (সাঃ) – আর রাহীকুল মাখতুম)

সবর মুমিনের বিপদে সাঙ্কনার পরশ:

বিচিত্র এই পৃথিবীতে কত রকম মানুষের বাস। কেউ সাদা কেউ কালো, কেউ ধনী কেউ গরীব, কেউ লম্বা কেউ খাটো, কেউ শাসক কেউ শাসিত, আরও কত কী! এই বৈচিত্র্যের মাঝেও ঐক্যের সুর- সুখ-দুঃখ মিলিয়েই মানুষের জীবন। ঘরবাড়ি নেই বলে রাস্তার পাশে ফুটপাথে যাকে মাথা গুজার ঠাঁই খুঁজতে হয় তার জীবনেও যেমন সুখের পরশ থাকে, তেমনি উঁচু উঁচু অটালিকায় যাদের বসবাস, কাড়ি কাড়ি সম্পদের অধিকারী যারা তারাও কখনো নীল হয়ে পড়ে দুঃখ-বেদনায়। দুঃখ-বেদনা বিপদ আর কষ্টের ধরনও অনেক। শরীর মন অর্থসম্পদ সম্মান-ঐতিহ্য ইত্যাদি কত দিক থেকে মানুষ বিপদের মুখে পড়ে। কেউ হয়তো শারীরিকভাবে অসুস্থ, কাউকে দেখা যাবে পারিবারিক কারণে গভীর দুশ্চিন্তার শিকার, কারও দীর্ঘদিনের অর্জন

সামাজিক সম্মানটুকু কখনো মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায়। এ সবই মানুষের বিপদ। মানুষের জীবনে বিপদ আসবেই। আল্লাহ তাআলার কেমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব (কখনও) ভয়-ভীতি, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জানমাল ও ফলফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। -
সূরা বাকারা (২) : ১৫৫

আরেক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা-

لَنُبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَ إِنْ تُصِرُّوْا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

তোমরা তোমাদের জান-মালের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষার মুখোমুখি হবে আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবার ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে অবশ্যই তা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা আলে ইমরান (৩) :
১৮৬

বোঝা গেল, বিপদ আসবেই। পবিত্র কুরআনের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় তো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানা ধরনে। সেই পরীক্ষায় সফল হওয়ার মূলমন্ত্রও ঘোষিত হয়েছে পাক কুরআনেই। সফলতার সেই মূলমন্ত্রের নামই সবার বা ধৈর্যধারণ। বিপদ যেমনই হোক, বিপদ তো বিপদই। কেউ যখন বিপদে পড়ে, তা ছোট-বড় যাই হোক, সে বিপদের মর্ম সে-ই বুঝে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি যদি কোনো দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার পরিবারের জন্যে তা যেমন মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পুরনো জুতাটি জায়গামতো না পাওয়াও একটি বিপদ। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি নগণ্য, কিন্তু সময়মতো এই এক জোড়া পুরনো জুতা না পাওয়া যে কত সংকটের সৃষ্টি করতে পারে তা ভুক্তভোগীই অনুভব করতে পারেন। ছোট-বড় সকল সংকটে মুমিন বান্দার মুখ থেকে তাই উচ্চারিত হয়- ইল্লা-লিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও কত বিস্তৃত দেখুন, তিনি বলেছেন,

إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ.

যখন তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তখনো তোমরা 'ইল্লা-লিল্লাহ' পড়ো। কেননা এটাও একটা বিপদ। -শুআবুল ইমান, বায়হাকী, হাদীস ৯২৪৪; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৩৪৭৫

যে কোনো রকম বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ইল্লা-লিল্লাহ পড়া- পবিত্র কুরআনের ভাষায় এটি ধৈর্যশীলদের পরিচায়ক-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

যারা যে কোনো রকম বিপদে আক্রান্ত হলে বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন-সন্দেহ নেই, আমরা আল্লাহরই, আর আমরা তো তাঁর কাছেই ফিরে যাব।’ -সূরা বাকারা (২) : ১৫৬

আরবী ভাষার শব্দ ‘সবর’। এর শাব্দিক অর্থ হলো আটকে রাখা। বিপদে পড়লে আমরা যে সবরের কথা বলি, এর অর্থ হলো, শরীয়ত-নিষিদ্ধ সব রকম কাজে জড়ানো থেকে নিজেকে আটকে রাখা। বিপদের মুখেও এমন কোনো কাজ করা যাবে না, শরীয়ত আমাদের যার অনুমতি দেয়নি। যেমন, কারও মৃত্যুতে বিলাপ করা, দুঃখে-কষ্টে জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা, আল্লাহ পাকের শানে অসঙ্গত কথা বলা কিংবা মনে মনে অসঙ্গত কোনো বিশ্বাস পোষণ করা ইত্যাদি। এসবে না জড়িয়ে দয়াময় আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা- এর নামই তো সবর। এই সবর মুমিনের হাতিয়ার। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

মুমিন বান্দা বিপদের মুখোমুখি হতে পারে দ্বীনের কথা প্রচার করতে গিয়ে, নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের ওপর টিকে থাকার সংগ্রামে। দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে, দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে কেউ যদি বিপদে পড়ে আর সবর করে, তখন আল্লাহ পাক তাকে পুরস্কৃত করবেন- এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমাদের জন্যে আশার কথা হলো, দ্বীনের সঙ্গে সামান্য সম্পর্কও নেই এমন ব্যক্তিগত কিংবা পার্থিব বিষয়েও যদি আমরা বিপদাক্রান্ত হয়ে সবরের পরিচয় দিই, তখনো আমাদের জন্যে রয়েছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা। হাত থেকে পড়ে কাচের দামি গ্লাসটা ভেঙে গেল, কিংবা বন্যার পানিতে মাঠভরা পাকা ধান তলিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে চোর হাতিয়ে নিয়ে গেল অর্থকড়ি- এমন বিপদে পড়েও যারা ‘ইন্না লিল্লাহ’ পড়ে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়, তাদের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ.

তাদের ওপরই রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও অনুগ্রহ, আর তারাই কেবল সঠিক পথপ্রাপ্ত। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৭

দুনিয়াতে যত বিপদ, এর মধ্যে প্রিয়জন হারানোর বিপদটিই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন। প্রিয়জন হতে পারে সন্তান, হতে পারে মা-বাবা কিংবা অন্য কেউ। এ কঠিন বিপদে যারা সওয়াবের আশায় সবর করবে তাদের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে-

مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.

আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো আপনজনকে মৃত্যু দিই আর সে সবর করে, তখন আমার কাছে তার একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪২৪

বিপদাপদ যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ, এ কথাটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ভিন্নভাবে। সহীহ বুখারীর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে আক্রান্ত করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৬৪৫

বিপদের সঙ্গে বান্দার ভালো-মন্দের সম্পর্ক আরেক হাদীসে আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতে তার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন, আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন তার পাপগুলো রেখে দিয়ে কিয়ামতের দিন তাঁর প্রাপ্য পূর্ণ করে দেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৬

আরেকটি হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاءُ، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

সত্যি, বড় পুরস্কার তো বড় বিপদের সঙ্গেই রয়েছে। আর আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন অবশ্যই তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। তখন যে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্যেই তাঁর সন্তুষ্টি, আর যে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে তার প্রতি তাঁরও অসন্তুষ্টি। (প্রাপ্ত)

এ দুই হাদীস সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, মুমিন বান্দা নিজের কৃত অপরাধের কারণেও বিপদের মুখোমুখি হতে পারে, আবার বিপদাক্রান্ত হতে পারে প্রভুর সঙ্গে তার ভালোবাসার যাচাইস্বরূপও। যে কারণেই হোক, অনাকাক্সিক্ষিত এ বিপদও তার জন্যে রহমত হয়ে থাকে। বিপদ যদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে এ বিপদে ভুগে সে গোনাহমুক্ত হয়ে ওঠে। আর বিপদ যদি হয় প্রভুর প্রতি তার ভালোবাসার পরীক্ষা, তাহলে সবার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালোবাসার বন্ধন হবে আরও দৃঢ়।

বিপদ তাই যেমনই হোক, যে কারণেই হোক, আল্লাহ পাকের ফয়সালা মনে করে তা মেনে নেয়া, মনে কোনোরূপ মন্দ ধারণা পোষণ না করা আর সবার সঙ্গে বিপদমুক্তির জন্যে আল্লাহ পাকের শরণাপন্ন হওয়া- এই তো মুমিন বান্দার কর্তব্য। বিপদে পড়ে সে অন্যকে দেখে অনুযোগের সুরে বলবে না- 'বারবার আমিই কেন বিপদে পড়ি' জাতীয় কোনো কথা।

বরং চরম বিপদের মুহূর্তেও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে- 'حَالُ كُلِّ عَلَى اللَّهِ الْحَمْدُ' অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন যে অবস্থায় রাখেন সর্বাবস্থায় তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা। এ সবার যদি অর্জিত হয় তাহলে অভাবের কঠিন পরিস্থিতিতেও অন্যের ধনসম্পদের প্রতি না তাকিয়ে

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সে বলবে- আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শোকর। এর বিপরীত যারা, অটালিকার চূড়ায় বসেও উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা কেবল আক্ষেপই করে যায়- আরেকটু যদি পেতাম, অমুকের মতো যদি এত সম্পদের মালিক হতাম ইত্যাদি।

সবরের এ ফযিলতের দিকে তাকিয়ে কেউ আবার বিপদ চেয়ে বসে কি না, হাদীস শরীফে সে বিষয়ে আবার সতর্কও করা হয়েছে। বিপদ তো এক অনাকাক্ষিক্ষিত বিষয়, সবরের সওয়াবের কারণে অনাকাক্ষিক্ষিত বিপদ কাক্ষিক্ষিত হতে পারে না। মানুষ মাত্রই বিপদ থেকে দূরে থাকতে চায়। বিপদে পড়ে গেলে মুক্তি কামনা করে। এটাই স্বাভাবিক। ইসলামের শিক্ষাও তাই। হাদীসের ভাষ্য-

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,) হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখে পড়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে আফিয়াত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তবে যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়বে তখন সবর করো। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৬৫(সূত্র -শিবির আহমেদ,আল কাওসার)

সার সারসংক্ষেপ

আবু দারদা রা. আমাদের তিনটি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন, যা দুর্বল করে দেয় মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিকে এবং সহায়তা করে স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে। তিনি বলেন, ‘আমি এমন তিনটি জিনিসকে ভালোবাসি, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে : দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি এবং মৃত্যু। দারিদ্র্যকে ভালোবাসি, কারণ তা রবের সামনে বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। মৃত্যুকে ভালোবাসি, কারণ রবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মৃত্যুই একমাত্র পন্থা। এবং রোগ-ব্যাধিকে ভালোবাসি, কারণ রোগ-ব্যাধি পাপরাশি মুছে দেয়।’ (আস-সিয়ার : ২০/১৪৯)

আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে বারবার আমাদের সবরের উপর আমলের উপদেশ দিয়েছেন। প্রায় ২৫টি আয়াতে ধৈর্য বা সবর বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে। নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবরের এক জ্বলন্ত মূর্ত প্রতীক। তার জীবনী থেকে আমরা দেখতে পাই জন্ম থেকে জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত কিভাবে তার জীবনকে বালা মুসিবত আঁকড়ে ছিল, আর তিনি ছিলেন রবের প্রতি কঠিন তাওয়াক্কুল, সবর এবং দোয়ার উপর অটল। পৃথিবীতে আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের প্রত্যেকের জীবন বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষা ও বালা মুসিবতের মাধ্যমে কেটেছে। তারা কখনোই ধৈর্য হারা হননি বরং এক একটি পরীক্ষা তাদেরকে আরো তাদের রবের নিকট প্রিয় করে তুলেছে।

সাহাবায়ে কেরাম তাবে তাবেঈন সহ পৃথিবীতে যত ওলি-আওলিয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দা এসেছেন তাদের প্রত্যেকের জীবন ছিল বালা মুসিবতের কাঁটা দিয়ে ঘেরা গভীর জঙ্গল। কিন্তু এই কঠিন সময়কে পার করেই তারা রবের নিকট পেয়েছেন সুউচ্চ স্থান। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবো বর্তমান দুনিয়ায়, যে যত বেশি ঈমানদার- মুমিন বান্দা, তার উপর বালা মুসিবতও তত বেশি। এর কারণ, কুরআনে এসেছে মুমিনদের উপর তাদের

জীবদ্দশায় বালা মুসিবত, বিপদ আপদ, অসুস্থতা, সম্পদের ক্ষতি, ফসল ফসলাদির ক্ষতি, জানমালের ক্ষতি এমন কিছু মুসিবত লেগেই থাকবে। যে ব্যক্তি এ সকল বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে নিজেকে রবের নিকট সাঁপে দিতে পারবে, পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে দৃঢ়ভাবে নিজের ঈমান আমলের উপর অবিচল থাকতে পারবে, সে ই এই আসল পরীক্ষায় বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সকল প্রকার বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে তাওয়াক্কুলের সাথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন, আমীন।